ব্যক্তিস্বাধীনতা

–রমা ঘোষ

"Man is the measure of everything"

–প্রোটাগোরাস

"man is the root of mankind.

–কার্ল মার্ক্স

উপরের উক্তি দুটি দুই আলাদা যুগের আলাদা দেশের দুজন প্রখ্যাতনামা চিন্তানায়কের। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁরা একমত –ব্যক্তিমানুষই মানবসমাজের, ব্যক্তির কল্যাণের পরিমাপেই সমাজের কল্যাণ পরিমেয়।

প্রতিটি ব্যক্তি তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটা নিজস্ব শরীর সহ এক একতন্ত্র অস্তিত্ব। সেখানে সে অদ্বিতীয়, তবুও, জন্মসূত্রেই শরীরবিজ্ঞানের ধর্ম অনুযায়ী সে যেমন তার পিতৃমাতৃবংশের 'জিন' গ্রহণ করে পূর্বপুরুষদের সংগে–এবং একই প্রক্রিয়ায় ভবিষ্যতে উত্তর পুরুষদের সংগে – অচ্ছেদ্য হয়ে হোক, অনিচ্ছায় হোক, সমাজের একটা অংশ হতে বাধ্য। তাই একতন্ত্র হয়ে, অদ্বিতীয় হয়েও সমাজবদ্ধ ব্যক্তি কখনো পুরোপুরি স্বাধীন নয়, একটা নির্দিষ্ট সমাজের কারাগারের মধ্যেই তার জন্ম – কাজের অনুশাসন আধিপত্য মেনে নিয়েই তার যাত্রারম্ভ।

তবু সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা শুধুমাত্র অসহায় বন্দীত্বে শেষ হলে সমাজও আগ্রাসে নিশ্চল হয়ে যেত। আর সমাজ যে আজপর্যন্ত এক বিন্দুও অগ্রসর হয় নি একথা কঠোর হতাশাবাদীরা ছাড়া কেউ বলবে না। এ প্রগতি সম্ভব হয়েছে কিছু প্রতিভাধর মানুষের স্বীকৃত অবদানে, এবং অগণিত মানুষের নীরব কিন্তু সৃষ্টিশীল কাজের ফলে। ব্যক্তির স্বাধীনতা তাকে দেশকালের – বর্ত্তমানের গন্ডী ছাড়িয়ে গিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারে, তার সৃজন প্রতিভা স্বপ্নকে বাস্তব করে – অবশ্যই, প্রায় সব সময়েই কাজের প্রতিবন্ধকতার মধ্যে, কারণ নতুন কিছু স্বতন্ত্র কিছু গ্রহণ করতে তার দেরী হয়, তবু এই পথেই আসে বিপ্লব – চিন্তাজগতে, সমাজে– রাজনীতিতে–মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় – কখনও দ্রুত, কখনও ধীরে, পরিস্থিতি অনুযায়ী। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই একটা শর্তের পূরণ হওয়া .....–সমাজে ব্যক্তির এই সৃজনশীল কল্পনার অবাধ অবকাশ থাকবে, সে যতই সমস্যাদীর্ণ হোক।

ইতিহাস কখনো থেমে থাকে না। যেমন সুস্থ শিশুর গত বছরের পোষাক পরের বছর মাপে খাটো হয়ে যায়, তেমনই স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিটি সমাজই নিয়ত পরিবর্তনশীল। তাই একদিন যে সমাজব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম হয়েছে, পরবর্তী দিনে সমাজের প্রয়োজনের মাপে সে খাটো হয়ে যাচ্ছে, তখনও তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইলে তা শ্বাসরোধী শৃংখলের মতো চেপে বসছে অসংখ্য মানুষের জীবনের উপর। শেষ পর্যন্ত অবশ্যই এই অসংখ্য জীবনের সম্মিলিত শক্তি কোনো না কোনো পথে আত্মপ্রকাশ করবেই। কিন্তু পরিবর্তন – আকাঙ্খার স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশের সুযোগ থাকলে বহু মানুষের অযথা দু:খভোগের বিলম্বিত খেসারত দিতে হয় না।

কোনো সমাজপরিবর্তন আকাঙ্খার জন্ম ব্যক্তির সচেতন সুস্পষ্ট ও স্বাধীন যুক্তি বুদ্ধিতে। তাই সমাজের স্রোত অব্যাহত রাখতে ব্যক্তির স্বীকৃতি চাই – যে স্বীকৃতি তার স্বাধীনতাকে সম্মান দেবে, তার স্বাধীন চিন্তা ও সৃষ্টির অবকাশ তৈরী করে দেবে।

এটা সত্য – মানবসমাজের সূচনা থেকেই সমাজের ক্ষমতা কাঠামো বা এসটাব্‌লিশমেন্টের সংগে ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক জলের মধ্যে মাছের মত স্বচ্ছন্দ স্বাধীন নয়; বরং তার কিছুটা মিল সর্বদেশীয় শিশুদের পরিচিত সেই অতিকায় দানবের সংগে যার নিষ্প্রাণ, হৃদয়হীন দানবীয় শক্তির সামনে পরাক্রান্ত রাজপুত্রেরা সব শিশুর মত অসহায় হয়ে পড়ে। এসটাব্‌লিশমেন্টের কঠিন বন্দীশালায় ব্যক্তি মানুষ প্রথম থেকেই নিয়ন্ত্রিত ও উপেক্ষিত।

শৈশবের রূপকথায় কখনো কখনো রাজপুত্র দৈত্যকে পরাস্ত করে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করত। কিন্তু আমাদের এই দানবের মজাটা হ'ল একে প্রায়শ:ই কেউ পদানত করতে পারে না, আর যদি দুর্লভ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্যিই কোনো মহারাজ তাকে বশীভূত করল, শতকরা ৯৯টা ক্ষেত্রে কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা যাবে সেই রাজপুত্রই আবার দানব হয়ে গেছে। তাই মানবকল্যাণের মন্ত্র উচ্চারণের করতে করতেই গণহত্যার প্লাবনে উজান বেয়ে সিংহাসনে বসেন নেপোলিয়ন, লেনিন, স্ট্যালিন, হিটলার, মুসোলিনী, মাও–ৎসে তুং। তাই সাম্য, স্বাধীনতার কল্যাণমূর্তি রক্ত পিপাসু আদিম দেবতার রূপ ধরে, বলিদানেরও ঘাটতি পড়ে না, তবু সমাজের শিকড়–মূলস্বরূপ–যে সাধারণ মানুষ তার কাছে সাম্য, স্বাধীনতা পৌঁছায় না। ইতিহাস বার বার প্রমাণ করেছে, যে সব দেশে ব্যাক্তি মানুষের মঙ্গল কামনা ঘোষণা করে একনায়কতন্ত্র সিংহাসন নিয়েছে, ব্যাক্তির বন্দীত্ব সেইখানে সব থেকে ভীষণ। তাই সফল ফরাসী বিপ্লবের পর উদ্‌গাতাদেরও কাটা মুন্ডু লুটোয় গিলোটিনের পায়ে, সফল রুশ বিপ্লবের অবসানে দশকের পর দশক জুড়ে প্রাকবিপ্লব দু:সময়ের আগুনে পরীক্ষিত প্রথম সারির নেতারাও দলে দলে হারিয়ে যান পৃথিবীর আলোটুকু থেকেও, মাওয়ের একদা ঘনিষ্ঠ কমরেডকেও শুধুমাত্র প্রাণ হাতে করে পালাতে গিয়ে জ্বলতে জ্বলতে শেষ হয়ে যেতে হয়, বিনা প্রতিবাদে – বিনা প্রতিরোধে। আর সাধারণ মানুষ? অবশ্যই মূক রবে। ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী। তবু এর মধ্যে থেকেও কখনো কখনো গর্জে ওঠে ব্যক্তিত্বই। সমাজকে বাঁচিয়ে রাখে, ইতিহাসকে বদ্ধ জলাশয় থেকে নদীখাতে মুক্তি দেয়। মানবসমাজ কঠিন বাধা ঠেলেও যতটুকু অগ্রসর হয়েছে তার ঋণ এই নির্ভীক বিবেকী প্রতিভার কাছে। অবশ্যই সে ঋণ তাঁদের জীবদ্দশায় ক্বচিৎ স্বীকৃত। তাই প্রাচীন গ্রীসে সক্রেটিসকে বিষপান করতে হয় জনসমক্ষে, মধ্যযুগে নিহত হন কোপারনিকাস (?) আর আধুনিক যুগে মানবতার অপরাধে শহীদ হন গান্ধীজী, মার্টিন লুধার কিং, প্রেসিডেন্ট কেনেডি। তবু তাঁদের হত্যাকারীরা সার্বিক নিন্দার পাত্র। খ্রীষ্টকে যারা ক্রুশে বিদ্ধ করেছিল তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘৃণিত। কিন্তু আজ ছয় দশক ধরে তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায যে অগণিত সম্ভাবনাময় জীবন শব্দহীন সাক্ষ্যহীনভাবে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে তার জন্য কে খেসারত দাবী করবে, কার হৃদয় দীর্ণ হবে বেদনা ও ঘৃণায়? ন্যুরেমবার্গ তদন্তের পরে হিটলারের গণহত্যার নমুনাতেও অন্তত সমগ্র বিশ্ব একমত হয়ে ধিক্কার জানিয়েছিল। কিন্তু সেদিন সেই ছিছিক্কারের কোরাসে যাদের কন্ঠ উচ্চগ্রামে বেজেছিল সেই কম্যুনিষ্ট দুনিয়ায় –তার মধ্যমণি রুশ রাজপ্রসাদ ক্রেমলিনে যদি ন্যুরেমবার্গের মত তদন্ত কোনোদিন হয় – হয়ত হিসেব পাওয়া যাবে আরো কত সোলঝেনিৎসিনের বুকের রক্তবিন্দু দিয়ে লেখা প্রতিবাদলিপি নিখোঁজ হয়ে গেছে লেখকের পিছু পিছু। হিটলারী অত্যাচার তো ছিল ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু এই দীর্ঘজীবী একনায়কী শাসনে কত অসংখ্য মানুষ চরম নিষ্ঠরতায় শেষ হয়েছে ও হবে তার হিসাব কে রাখে? যে যুদ্ধে হিটলার ধ্বংস হয়েছিল, সেই যুদ্ধেই তার এক সময়ের মিত্র স্ট্যালিন একনায়কী রাশিয়ায় কায়েম হয়ে বসেছে আরো দৃঢ় হয়ে। মার্ক্স–লেনিনের প্রতিশ্রুতিমত রাষ্ট্রযন্ত্র শুকিয়ে ঝরে পড়ে নি, তা দিনে দিনে আরও বিশাল ও মজবুত হয়েছে, ব্যক্তি মানুষ এর কাছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধূলিকণা। জন্মসূত্রে সোভিয়েত নাগরিকের সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত রাষ্ট্রীয় অভিভাবকদের হাতে। তবু এই সুদীর্ঘ পেষণেও সেখানে সব মানুষকে স্বাধীন চিন্তা বিবর্জিত .Conformism এর ছাঁচে ঢালাই করা যায় নি। তাই আজও মাঝে মাঝে সোলঝেনিৎসিন, সাখারভেরা রাষ্ট্রীয় অভিভাবকদের তর্জনীনির্দেশ উপেক্ষা করে গর্বোদ্ধত মাথা তুলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন, যে কোন পরিণামের ঝুঁকি নিয়ে। রাশিয়াতে যদি কখনো ব্যক্তি স্বাধীনতা ফিরে আসে – সেই অসম্ভব সম্ভব হয় সেদিন এই মানুষেরা স্বীকৃতি পাবেন, আজ যাঁরা নিন্দিত, অত্যাচারিত নির্বাসিত।

তবে তা অদূর ভবিষ্যৎ নিশ্চয় নয়। আধুনিক যুগকে বলা হয় গতির যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অদ্ভূত উন্নতির সংগে সময়েরও গতিবেগ বেড়ে গেছে। আজ যা নতুন পাঁচ বছর পূরণ হবার আগেই বাতিল হয়ে যাচ্ছে জীবনের সব ক্ষেত্রে। জীবনযাত্রার উপকরণ থেকে শুরু করে সামাজিক মূল্যবোধ পর্যন্ত। তাই এক জেনারেশনের সংগে আর এক জেনারেশনের ফারাক বেড়ে চলেছে দ্রুত। পৃথিবীর সব মুক্ত দেশের নবীন প্রবীণের দ্বন্দ্বে সমাজ উথাল পাতাল। প্যারিস থেকে শ্রীলংকা

জাপান থেকে আলস্টার, ভেনেজুয়েলা থেকে ন্যু ইয়র্ক–গত দুই দশক ধরে যুববিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে গেছে। প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এসটাব্‌লিশমেন্টের বিরুদ্ধে যুবকেরা বিদ্রোহ করেছে উন্নত–অনুন্নত দেশ নির্বিশেষে, রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে। কিন্তু রাশিয়ার মত বিশাল ঐতিহ্যপূর্ণ দেশে ছাত্রযুবকরা স্তব্ধ। সোভিয়েত পত্রপত্রিকায় যাদের স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ হাসিমুখের ছবি দেখা যায় তারা সব ভাল ছাত্র, আদর্শ কর্মচারী। তাদের কোনো ক্ষোভ নেই, কোনো বক্তব্য নেই সমাজ সম্পর্কে, কোনো নির্দেশ , আশংকা সতর্কবাণী, স্বপ্ন দেখা–কিছু নেই। তাঁরা শুধু water-tight compartment এ জীবনটাকে ভাগ করে নিয়ে – শুধুই ছাত্র, বা শুধুই শিক্ষক বা শুধুই কর্মচারী হয়েই সুখী, চিত্রটা এইরকমই তুলে ধরা হয়। মাও–ৎ–সেতুং তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ".The world is mine, and the world is yours, but in the ultimate analysis the world is yours." সমগ্র বিশ্ব যখন এই নবীন প্রবীণের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে নবীনকে স্বীকার করে নিয়ে, তখন রাশিয়াতে কিন্তু কোনো দ্বন্দ্বের প্রকাশ নেই।

দার্শনিক হেরাক্লিটাস বলেছিলেন – দ্বন্দ্বই সব কিছুর জনক। প্রকৃতপক্ষে বিস্তৃতভাবে দেখলে জীবনের সব ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বই গতির জনক, বিকাশের পূর্বশর্ত। দুই বিরোধী শক্তির বিপরীতমুখী আকর্ষণের ফলেই গ্রহনক্ষত্রেরা তাদের কক্ষপথে ছুটে চলেছে, দুই বিপরীত নিষ্পেষনের মধ্য দিয়ে প্রতিটি বীজের আবরণ ভেদ করে অঙ্কুরোগ্দম হয়, প্রতিটি পল্লবের জন্ম হয়। প্রাণীজগতেও তাই। দ্বন্দ্ব জীবনের বিকাশে বাধা নয়। দ্বন্দ্বই বিকাশের শর্ত। একথা মানব সমাজ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। মার্ক্সও মানুষের ইতিহাস বিশ্লেষণে এই দ্বন্দ্বের প্রধান ভূমিকা প্রত্যক্ষ করেছেন, যদিও তাঁর স্বপ্ন ছিল মানবসমাজ তার প্রতিশ্রুত স্বর্গে পৌঁছে যাবার পরে আর দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকবে না।

দ্বন্দ্বমুখর বিশ্বে আপাতত: রাশিয়া ও তার উপগ্রহগুলিতে প্রশান্তি বিরাজমান। তাহলে কি সেখানে স্বর্গ নেমে এসেছে ধূলার ধরণীতে? তাই সেখানকার প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে কোথাও ক্ষোভ নেই, তার পরিবর্তন বা বিবর্তনের কথা কেউ চিন্তা করতে পারে না?" কিন্তু তাহলে বারে বারে মায়াকভস্কি, পাস্তেরনাক, সোলঝেনিৎসিন, শাখারভদের আবির্ভাবের কী ব্যাখ্যা হতে পারে?

১৯৬৮–র একদিন যখন চেকোশ্লোভাকিয়ায় হঠাৎ দলে দলে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পথে বেরিয়ে পড়েছিল সেদিন তাদের স্লোগান ছিল, 'আমরা আলো চাই।' শ্বাসরোধী অন্ধকারে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কাটতে তারা একটু আলো, একটু হাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। তারা চেয়েছিল স্বাধীনতা, স্বনিয়ন্ত্রণের অধিকার – জাতি হিসেবে, নাগরিক হিসেবে। তাই তারা অবশেষে প্রতিবাদ জানিয়েছিলে প্রচলিত একনায়কীর বিরুদ্ধে, রুশীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে। অবশ্যই এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে প্রাগের অন্ধকার নতুন প্রভাতে উত্তীর্ণ হয়নি। কারণ বিরোধিতার শক্তি অচিরে রাশিয়ার 'ভ্রাতৃপ্রতিম' ট্যাংকের তলা গুঁড়িয়ে গেছে, যেমন গিয়েছিল আরো বারো বছর আগে হাঙ্গেরীতে, পোল্যান্ডে।

গুলাগ দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপ থেকে দীপান্তরে বিরোধিতার – স্বাধীন চিন্তার লক্ষ কোটি বীজ অঙ্কুরে বিনষ্ট করার অক্লান্ত প্রচেষ্টা চলেছে প্রতিদিন – কনসেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পে, সাইবেরিয়ার হিমঅরণ্যে, রাজধানীর বুকের মধ্যে মুহূর্তে মুহূর্তে গোপন বন্দীশালার দরজা খুলে যাচ্ছে, যে দরজা দিয়ে শুধু প্রবেশ করা যায়, নিষ্ক্রমণ হয় না। বিরোধিতার কণ্ঠস্বর সেখানে রুদ্ধ। তাই সমাজ বিবর্তনের স্বাভাবিক ও অনিবার্য পূর্বশর্ত দ্বন্দ্ব সেখানে অনুপস্থিত। নতুবা রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থা প্রায় ছয় দশক ধরে অচলাবস্থায় থেকে যেত না, তার বিবর্তন ঘটতই।

অবশ্যই কম্যুনিষ্ট দুনিয়া একনায়কত্বের একমাত্র উদাহরণ নয়। কিন্তু এটাও ঠিক আধুনিক বিশ্বে ব্যক্তি স্বাধীনতার স্থায়ী অপহরণের কম্যুনিষ্ট দেশগুলির এসটাবলিশমেন্ট এক চরমতম উদাহরণ। আধুনিক যুগে উন্নত বিজ্ঞানের সাহায্যে, কুশলী সেনাবাহিনী ও শক্তিশালী প্রশাসনিক জলের পিছনে এসটাবলিশমেন্ট প্রতিটি দেশেই প্রতিদিন আরও বেশি শক্তিসংগ্রহ করছে। এই সামগ্রিক পরিস্থিতির মধ্যে সর্বহারার নামে সর্বহারা তথা সর্বসাধারণের উপর যেখানে সগর্ব একনায়কত্ব স্থাপিত

হয় সেখানে সেই অতি সুকঠিন সুদৃঢ় .establishment –এর হাতে ব্যক্তিমানুষের পরিত্রাণ কোথায়। তার স্বাধীনভাবে নি:শ্বাস নেবার মত হাওয়া, নিজের চোখে জগত দেখবার মত আলো – এই ন্যূনতম দাবীটুকুই মহা অপরাধ।

মানববাত্মার এই চরম অবমাননা সমাজকে নিশ্চল করে। অপরদিকে রাষ্ট্রনায়কদের করে শক্তিমদমত্ত। তার ফলে বিপদগ্রস্ত শুধু স্বদেশী আত্মীয়েরাই নয়, বিদেশী প্রতিবেশীরাও।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে, যে রাষ্ট্র স্বদেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করেছে পরবর্তী পদক্ষেপে সে পররাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণে উৎসুক হয়েছে। এইখানে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রনায়কদের সংগে তথাকথিত ফ্যাসিবিরোধী কম্যুনিষ্ট, রাষ্ট্রনায়কদের কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষায় কেউ কারো থেকে পশ্চাৎপদ নয়। শুধু স্থান কাল পাত্রভেদে পদ্ধতিগত কিছু হেরফের হয় এই মাত্র। প্রতিবেশী ভারতের উপর চীনের এই শক্তিমদমত্ত থাকবার ক্ষত গত তেরো বছরেও সম্পূর্ণ শুকোয়নি। অপরদিকে নিজের উত্তর সীমান্তে চীন বিপন্ন রাশিয়ার আগ্রাসী আকাঙ্খার মুখে, যে আকাঙ্খার মুখে সশংক পূর্ব ইউরোপের ক্ষুদ্রায়তন কম্যুনিষ্ট দেশগুলি। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হয়েও তাদের কেউ কেউ ''ভ্রাতৃপ্রতিম'' রাশিয়ার আরোপিত ''সীমিত সার্বভৌমত্ব'' মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। নানাধরণের ''সহযোগিতা'' ও 'মৈত্রী–র ছদ্মবেশে রাশিয়ার প্রচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ক্রমবিস্তৃত। চীন তার অতিকায় দেহ ও অতি বিশাল জনসমষ্টি নিয়ে স্বদেশে রুশী অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে চেয়েছে ও পেরেছে বলেই কম্যুনিষ্ট দুনিয়ায় প্রতিবেশী রুশ চীনের মধ্যে আবার উঠেছে দ্বিতীয় মহাপ্রাচীর। স্বাভাবিক ভাবেই ভারতের মত একটি সুবিশাল উন্নয়নশীল প্রতিবেশী দেশ যেমন চীনের লোলুপ দৃষ্টি এড়াতে পারে নি, তেমনই রাশিয়ারও লুব্ধ দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না।

আমেরিকার ভিয়েতনাম নীতির বিরুদ্ধে সেখানকার সাধারণ মানুষ বারবার ব্যক্তিগত ও সংগঠিত ভাবে আন্দোলন করবার সুযোগ পেয়েছে। তবুও ভিয়েতনামে অস্ত্রবর্ষণ তারা মাঝে মাঝে সাময়িকভাবে হলেও পুরোপুলি বন্ধ করতে পারে নি। আর রাশিয়াতে তো প্রতিবাদের কোনো সুযোগই নেই। তার ঔপনিবেশিক লোলুপতাকে সংযত করবে কে?

সুতরাং, সচেতন ও সতর্ক হতে হবে তাদেরই যাদের উপর এই ঔপনিবেশিক আগ্রাসন নেমে আসতে পারে। আমেরিকা মহাসাগরের ওপার থেকে তার গুপ্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে যদি দেশীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে, নিকট প্রতিবেশী রাশিয়ার হাতে আমাদের বিপদ তার থেকে বেশি বৈ কম নয়। রাশিয়া একবার যেখানে ''মুক্তিদাতা''–র ভূমিকায় অবতীর্ণ সেখানে জাতীয় সার্বভৌমত্ব বা ব্যক্তি স্বাধীনতা কোনোটাই বজায় রাখা সহজ নয়, বরং অসম্ভব। এই সম্ভাব্য বিপদটা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার। আজকে ওয়ারশ চুক্তি ভুক্ত দেশগুলির অবস্থা থেকে যদি আমরা এটুকু শিক্ষা না নিই, তাহলে ইতিহাসের কাছে অপরাধ করা হবে। ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাক তরুণ জন পাল্‌ক্ প্রাগের প্রকাশ্য রাজপথে এক আশ্চর্য মশাল হ'য়ে জ্বলে উঠেছিল। তার পিছনে একের পর তরুণ যুবক স্বেচ্ছায় জলন্ত অগ্নিশিখা হয়ে গেছে। সে দেশের সৃজনশীল তারুণ্য যে 'কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে' এই অদ্ভুত আত্মাহুতির দৃশ্য তার সাক্ষী।

ইতিহাসের এই রূঢ় শিক্ষাকে কি আমরা গ্রহণ করব না?

"The People, what have the people to do with laws ecept to obey then," exclaimed a French king faced with popular interest,